বার্মার নিম্ন এলাকা মৌলমিতে আমি ছিলাম বহু মানুষের অবহেলার পাত্র। আমার জীবনে একবারই আমি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠি। আমি ছিলাম মহকুমা শহরের পুলিশ কর্মকর্তা। আর উদ্দেশ্যহীন, নির্দয়প্রায় এই গোষ্ঠীর মাঝে ইউরোপীয় বিরোধী চিন্তাচেতনা ছিল খুবই তিক্ত পর্যায়ের। তবে দাঙ্গা বাঁধানোর মতো সাহস কেউ দেখায়নি। কিন্তু যদি একজন ইউরোপীয় মহিলা একাকী বাজারের পথ দিয়ে হাটতে থাকে তবে কেউ হয়ত তার মুখ নিসৃত পানের পিক মহিলার পোশাকে ছুড়ে দেয়। একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে আমি ছিলাম তাদের প্রধান লক্ষ্য এবং তারা নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রেখে আমাকে বিদ্রুপ করত। যখন ফুটবল খেলার মাঠে সাধারণ একজন বার্মিজ আমাকে ফাউল করত এবং রেফারি (অন্য একজন বার্মিজ) দেখেও না দেখার ভান করত, উপস্থিত দর্শকেরা তখন উচ্চস্বরে হেসে উঠত। বহুবার আমি এ রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। হলদে মুখোযুবক বার্মিজগুলো সুযোগ পেলেই আমাকে নিয়ে রসিকতা করত তখন নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতাম, এসব বিষয় আমার স্নায়ুতে পীড়া দিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছিল যুবক বৌদ্ধ শ্রমনেরা। শহরে তারা কয়েক হাজার ছিল, কখনো কেউ তাদের কোন কাজ করতে দেখেনি, সুযোগ পেলেই এরা ইউরোপিয়ানদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ করত।

পুরো ব্যাপারটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং মেজাজ খারাপ হওয়ার মতো বিষয়। আমি দ্রুত মানসিক দিক থেকে একটি সিদ্ধান্তে এলাম যে, সাম্রাজ্যবাদ একটি নিম্নমানের ব্যাপার এবং যত তাড়াতাড়ি আমি এ চাকরি ছাড়তে পারব ততই আমার জন্য মঙ্গল। নিয়মতান্ত্রিক দিক ও মানসিক দিক থেকে আমি বার্মিজদেরই সমর্থন করতাম আর বিরোধিতা করতাম অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের। যে চাকরিটা আমি করছি এ কাজটিকে যে আমি কতটা ঘৃণা করতাম তা কথায় বোঝানো যাবে না। এ রকম একটি চাকরিতে থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নানা অপকীর্তি খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। দুর্ভাগা কয়েদিরা পুতিগন্ধময় জেলখানায় ঠাসাঠাসি অবস্থায় তালাবন্দী, ধুসর রঙা ভীতি ছাওয়া মুখমণ্ডলধারী দীর্ঘ মেয়াদি আসামি, কোমরে বাঁশের লাঠির পিটুনিজনিত আঘাতপ্রাপ্ত ভীতু আসামিরা। এইসব দৃশ্য আমার মধ্যে একটা তীব্র অপরাধবোধ তৈরি করেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছুই করার ছিল না। আমি ছিলাম যুবক এবং কম শিক্ষিত এবং পূর্বাঞ্চলে আমার মতো অনেক ইংরেজেরই একই রকম অবস্থা ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমে বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে কি না তা আমি জানি না। তাদের সরিয়ে দেয়াটা কতটা যুক্তিসম্পন্ন সেসবও আমি জানার চেষ্টা করিনি। আমি শুধু এটাই ভাবতাম যে, একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারি করছি তাদের আমি পছন্দ করি না, অপরপক্ষে নিচুমনা বার্মিজ পশুগুলোকেও আমি অপছন্দ করি। কারণ তারা আমার কর্তব্যপালন বিষয়টিকে একেবারে অসম্ভব করে তুলেছিল। আমি আমার একগুয়ে মনোভাব নিয়ে একদিকে চিন্তা করতাম যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটি সীমাহীন অত্যাচারের প্রতীক যা সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন করছে, আবার এটাও চিন্তা করতাম যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো কর্ম হবে একজন বৌদ্ধ শ্রমণের উপর বেয়োনেট চার্জ করা। এ রকম ভাবনা সাম্রাজ্যবাদেরই কুফল বলা চলে। একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কর্মকর্তা যখন কাজের অবসরে থাকে এ বিষয়ে তাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে যা কোনো না কোনো দিক থেকে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। এটি ছিল খুবই ছোট একটি ঘটনা তবে তা সাম্রাজ্যবাদ তথা এর গতিপ্রকৃতি বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে, শাসককুলের স্বেচ্ছাচারী নীতিরও প্রকাশ ঘটায়। একদিন খুব ভোরবেলায় পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টর অন্য একটি শহর থেকে আমাকে টেলিফোনে জানায় যে, একটি হাতি বাজারে প্রবেশ করে সবকিছু ভেঙ্গে তচনচ করছে। এ ব্যাপারে দ্রুত একটা কিছু করার জন্য আমাকে আহবান করা হল। এ মূহুর্তে কী করব তা ঠিক করতে পারলাম না।

কিন্তু আসলে কী ঘটেছে আমি তা জানতে চাচ্ছিলাম। এ কারণে আমি একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাত্রা করলাম। আমি আমার পুরনো .৪৪ উইনচেস্টার রাইফেলটি সঙ্গে নিলাম, যদিও এটা একটা হাতি মারার জন্য যথেষ্ট বৃহৎ এবং শক্তিশালী নয়। কিন্তু আমি ভাবলাম এটির গুলির শব্দ হাতিটিকে অন্তত ভয় দেখাতে সক্ষম হবে। অনেক বার্মিজ আমাকে পথে থামিয়ে হাতিটি কি কর্ম করেছে তা জানাতে লাগল। হাতিটা বুনো ছিল না, ছিল পোষা হাতি, হঠাৎ করেই ক্ষেপে গেছে। এটিকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল। পোষা হাতি ক্ষেপে যাওয়ার ভয় থাকলে এভাবেই তাদের বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু গত রাতে হাতিটি শেকল ছিড়ে পালিয়ে যায়। সে সময়ে এর মাহত কিংবা এর মালিক একে শান্ত করতে পারত। মাহুত প্রাণীটির খোঁজে ছুটাছুটি করতে থাকে। কিন্তু ভুল রাস্তায় সে হাতিটিকে প্রায় বারো ঘণ্টা খোজাখুঁজি করে। সকালবেলায় ফের হাতিটাকে শহরে দেখা যায়। বার্মার নিরস্ত্র মানুষজন খুবই বিপন্ন বোধ করছিল। হাতিটা অনেকেরই বাঁশ দ্বারা তৈরি ঘরবাড়ি এবং জিনিসপত্র ধ্বংস করে, গরু হত্যা করেছে, ফলের বাগানও তচনচ করেছে। সব মালামাল বিনষ্ট করেছে। মিউনিসিপ্যালিটির একটি ময়লা ফেলার গাড়িতে হাতিটি হামলা চালালে এর ড্রাইভার প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়, হাতিটি গাড়িটা উল্টে ফেলে দেয়।

হাতিটি যে স্থানে দেখা গেছে সেই জায়গায় বার্মার সাব-ইনস্পেক্টর কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে আমার পৌছার অপেক্ষায় ছিল। এলাকাটিতে ছিল খুবই দরিদ্র লোকদের বসবাস এবং অপরিচ্ছন্ন বাঁশের ঘরে ঘিঞ্জিমতো জটিল জায়গা। পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা এসব ঘর তালপাতা ছাওয়া। আমার মনে আছে আকাশ ছিল খুবই মেঘাবৃত, পুরো সকালটাই ছিল বৃষ্টিমুখর একটি অবরুদ্ধকর অবস্থায়। হাতিটি আসলে এখন কোথায় আছে এটা জানার জন্য আমরা স্থানীয় লোকজনের মধ্যে খোজখবর করলাম। কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোনো সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল না। প্রাচ্যের দেশগুলোতে এ রকমই ঘটে। দূর থেকে শোনা একটি গল্প খুবই স্পষ্ট এবং তথ্যবহুল মনে হয়, কিন্তু কাছে গেলে বিষয়টি জটিল ও অস্পষ্ট হয়ে যায়। কেউ হয়ত বলে, হাতিটি এই দিকে গেছে অন্যজন হয়ত আরেক দিক দেখিয়ে বলে, এই পথে গেছে। অনেকে আবার বলল, তারা এ ব্যাপারে কোনো কিছুই জানে না। এরই মাঝে আমি ধারণা

করলাম যে, খুব সম্ভব পুরো বিষয়টিই একটি আজগুবি কাহিনী এবং মিথ্যে ব্যাপার। ঠিক সে সময়েই একটু দূরে চিৎকার শুনতে পেলাম। খুব জোরে গলা ফাটানো একটা চিৎকার ভেসে এল, দূরে সরে যাও বাচ্চারা, যত তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে সরে পড়ো একজন বৃদ্ধা হাতে একটা কঞ্চি নিয়ে কুড়েঘরের কাছে এল। মহিলারা একদল ল্যাংটা ছেলেমেয়েকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল আরো বেশ কিছু মহিলা ওদের অনুসরণ করতে করতে মুখ দিয়ে নানা রকম বাক্যবান বর্ষণ করছিল। তারা এই ভয়াল পরিস্থিতি থেকে ছেলেমেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখাটাই উত্তম মনে করছিল। আমি কুঁড়েঘরটা ঘুরে উঠে হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় একটি মৃতদেহ কাদায় পড়ে থাকতে দেখলাম। লোকটির গায়ের রঙ কালো, ভারতীয় দ্রাবিড় কুলি। অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকা এ লোকটি বেশি আগে মারা গেছে বলে মনে হল না। জানা গেল, হঠাৎ করেই হাতিটি কুঁড়েঘরের কাছে এসে লোকটিকে শুড় দিয়ে প্যাঁচ দিয়ে ধরে তার মেরুদণ্ডে আঘাত করে মাটিতে একেবারে পিষে ফেলে। সময়টা ছিল বৃষ্টির মৌসুম, আর মাটিও ছিল নরম। লোকটার মুখে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। তার হাত দুটোপেটের উপর কুশ চিহ্ন করে রাখা, মুখটা কর্দমাক্ত, চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখ কর্দমাক্ত আর দাঁত খিচুনি দিয়ে লোকটা মরে পড়ে আছে। (দুঃখের সাথে বলছি যে, আমি স্বীকার করতে পারছি না যে, মৃত ব্যক্তিদের খুবই নীরব এবং শান্ত দেখায়। বরং আমার দেখা প্রায় মৃতদেহগুলোই ছিল দেখতে শয়তানের মতো)। ঠিক খরগোশের শরীর থেকে চামড়া তুলে ফেললে যেমন হয় লোকটির শরীরের চামড়া উঠে গেছে ঠিক তেমনি করে । মৃত লোকটিকে দেখেই আমি আমার আর্দালিকে বললাম, কাছেই আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে একটি হাতি মারা রাইফেল আনার জন্য। আমি আমার ঘোড়াটিকে পিছিয়ে আনলাম। নিজেকে পাগলা হাতির সামনে ছুড়ে ফেলে নিষ্পেষিত হতে চাইলাম না।

অল্প কয়েক মিনিট পরেই আর্দালি একটি রাইফেল ও পাঁচটি কার্তুজ নিয়ে এল। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন বার্মিজ আমাকে জানাল যে হাতিটা এখন নিম্ন ভূমিতে ধানক্ষেতে অবস্থান করছে। মাত্র একশত গজ দূরে। যখন আমি সামনে এগুতে লাগলাম তখন ঘরবাড়ি থেকে দলে দলে লোক বের হয়ে আমার সাথে সাথে এগুতে লাগল। ওরা আমার হাতে রাইফেল দেখে উচ্চস্বরে বলতে লাগল যে, আমি হাতিটিকে শিকার করতে যাচ্ছি। হাতিটা যখন তাদের ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করছিল তখন কিন্তু তারা হাতীটাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। এখন হাতিটাকে হত্যা করা হবে জেনে সবাই খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছে, এখানে একটি কৌতুককর ব্যাপার এই যে, তারা হাতির মাংস নিতে আগ্রহী। এ বিষয়টি আমাকে খুবই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলল। আসলে হাতিটাকে হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। আমি শুধু নিজেকে রক্ষা করার জন্যই রাইফেল হাতে নিয়েছিলাম। আর একদল লোকের অনুসরণ করার ব্যাপারটিও আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আমি পাহাড় বেয়ে নিচে নামলাম, তাকিয়ে দেখলাম এবং নিজেকে বোকা মনে হল। আমার কাধে রাইফেল এবং ক্রমবর্ধমান সেনাদলের মতো লোকজন কর্তৃক আমাকে অনুসরণ করার বিষয়টি ছিল কেমন যেন খাপ ছাড়া। নিচে, কুঁড়েঘর থেকে বেরুলে প্রথমেই পাথুরে রাস্তায় পা ফেলতে হয় এবং এরপর হাজার গজ দূরেই ভিজে কর্দমাক্ত শস্যের জমি, জমি আনাবাদী কিন্তু মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের জন্য রুক্ষ কর্কশ ঘাসে ঢাকা। প্রধান রাস্তা হতে আশি গজ দূরেই হাতিটা দাঁড়িয়ে ছিল। তার বাম পাশটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। লোকজনের ভিড় হাতিটা খেয়াল করেনি। সে ঘাসের গুচ্ছ ছিড়ে ছিড়ে তুলছিল, এরপর তার হাটুতে তা ঝেড়ে পরিষ্কার করে মুখের ভেতর চালান করে দিচ্ছিল। আমি পথে থামলাম। হাতিটিকে দেখামাত্রই গুলি না করাটাই আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম। একটি সচল হাতিকে গুলি করে হত্যা করা মারাত্মক ব্যাপার। এ রকম একটি প্রাণী হত্যা করার মানেই হল দামি কোনো যন্ত্র বা মেশিন ধ্বংস করে ফেলা – এ রকম একটি হত্যার ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। দূরে দাঁড়িয়ে হাতিটা যখন ঘাস মুখে পুরছিল তখন তাকে দেখতে একটা নিরীহ গরুর মতোই মনে হচ্ছিল। আমি ভাবলাম এর উন্মত্ততার ভাবটি এখন আর নেই। আর মাহুত কিংবা এর মালিক না আসা পর্যন্ত এটি নীরিহ প্রাণীর মতোই এখানে থাকবে। এ ছাড়া আমি মোটেই একে গুলি করতে আগ্রহী নই। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এখানে দাড়িয়ে থেকে প্রাণীটা যে আর আক্রমণ করবে না সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হব এবং পরে বাড়ি ফিরব কিন্তু ঐ মূহুর্তেই আমাকে ঘিরে এগিয়ে আসা চারপাশের জনতার মাঝে চোখ ফেললাম।

এটি ছিল বিশাল জনতার সমাবেশ, কম করে হলেও দুহাজার এবং প্রতি মিনিটে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচুর জনতার ভিড় দীর্ঘ পথের দুপাশ দখল করে আছে। তাকিয়ে দেখলাম, চটকদার সব পোশাক পরা হলদেটে মুখগুলো। ওরা সবাই ভীষণ উৎফুল্ল আর উত্তেজিত। সর্বোপরি মজা এটাই যে, হাতিটাকে নিশ্চিত হত্যা করা হবে। জাদু দেখানোর সময় একজন জাদুকরের দিকে যেমন সবার নজর আকৃষ্ট হয় সেভাবে সবাই আমার দিকে উৎফুল্ল হয়ে তাকিয়ে ছিল। যদিও ওরা আমাকে মোটেই পছন্দ করে না কিন্তু আমার হাতে রাইফেল থাকার জন্য এ মূহুর্তে ওদের কাছে আমি একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছি। হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম যে হাতিটাকে গুলি করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, জনতাও আমার কাছে তাই আশা করছে এবং আমাকেও তাই করতে হবে। আমি এটা স্পষ্ট অনুভব করলাম যে, এই দুহাজার লোকই আমাকে এ কাজে বাধ্য করছে এবং সেই মূহুর্তে আমি আমার রাইফেল হাতে তুলে প্রস্তুত হলাম আর তখনি প্রথম আমি অনুভব করলাম, পূর্ব দেশে সাদা চামড়ার লোকদের ব্যর্থতা এবং অসারতার কথা। এই আমি, সাদা চামড়াধারী অস্ত্রধারী একজন মানুষ। অস্ত্র বিহীন নিরীহ লোকদের কাছে আমি একজন প্রধান অভিনেতা হিসেবে উদিত হয়েছি। আর এই স্থানীয় বার্মিজরাই ক্রমাগত আমাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছিল। আর সে মূহুর্তে আমি ভাবলাম যে, একজন সাদা চামড়ার লোক যখন অত্যাচারী হিসেবে আবির্ভূত হয় তখন সে শুধু তার নিজের স্বাধীনতাকেই বিনষ্ট করে। সে তখন একজন বোবা অভিনেতার ভূমিকা পালন করে আর এটাই হল সাহেবিয়ানার রীতি। তার আইনের প্রধান শর্তই হল সারা জীবন শুধু স্থানীয় লোকদের দমনপীড়ন করা আর সব রকম সমস্যায় স্থানীয় মানুষদের মতামত গ্রহণ করার কোনো সময় থাকে না তার। এই সাহেবকুল মুখের মাপমতো একটি মুখোশ পরিধান করে। আমাকে

হাতিটাকে গুলি করতে হয়েছিল। রাইফেল আনার নির্দেশ প্রদান করে আমি হাতিটাকে গুলি। করার রাস্তা খুলে দিলাম। একজন সাহেবকে সাহেবের মতোই আচার-আচরণ রপ্ত করতে হয়। দু'হাজার লোক পরিবৃত হয়ে সারা পথ আমি রাইফেল হাতে করে এলাম। এরপর কিছু না করাটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। জনতা আমাকে দেখে হাসবে। এবং আমার পুরোটা জীবন, প্রাচ্যে প্রতিটি সাদা চামড়ার মানুষদের জীবন একটি সংগ্রামী জীবন, হাসির ব্যাপার নয়।
কিন্তু আমি হাতিটাকে গুলি করতে চাইনি। আমি পর্যবেক্ষণ করছিলাম তার দাদিমা সুলভ ভঙ্গিমা, কেমন করে সে ঘাসগুলো হাটুতে ফেলে ঝাড়ছিল। আমি ভাবলাম এ প্রাণীটাকে গুলি করা হত্যা হিসেবে পরিগণিত হবে। পশু শিকার বিষয়ে এ বয়সে আমি মোটেই পিছিয়ে পড়ার মতো মানুষ ছিলাম না। যাই হোক, এত বড় একটা পশু হত্যা করা খুবই খারাপ বলে মনে হয়। পাশাপাশি এই প্রাণীটার মালিকের কথাও ভাবতে হবে। একটি জীবিত হাতির কম। করে হলেও, একশত পাউন্ড মূল্য। আর মৃত এই প্রাণী ও তার দাঁত থেকে বড়ো জোর পাঁচ পাউন্ড পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাকে দ্রুত সক্রিয় হতে হয়েছিল এ বিষয়ে। আমি ঘুরে কিছু অভিজ্ঞ বার্মিজদের দিকে তাকালাম, যারা আমার এখানে আসা অবধি আছে। তাদের জিজ্ঞেস করলাম হাতিটা কেমন আচরণ করত। তারা সবাই একই কথা বলল। ওটাকে ওখানে একা ফেলে এলেও সে কিছুই খেয়াল করতনা কিন্তু কাছে গেলে আক্রমণও করতে পারত। আমাকে কী করতে হবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমি হাতিটার আচরণ পরীক্ষা করার জন্য পচিশ গজ সামনে এগিয়ে গেলাম। যদি সে আক্রমণ করে, আমি গুলি ছুড়ব, সে যদি আমার উপস্থিতি টের না পায় তাহলে হাতিটার মাহুত না আসা পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাকাটাই ভালো। আমি রাইফেল চালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলাম না, আর মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে তা দেবে যাচ্ছিল, হাতিটি আক্রমণ করলে আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারত। তখন আমার অবস্থা হত স্টিমরোলারের নিচে চাপা পড়া ব্যাঙের মতো। কিন্তু তখন পর্যন্তও আমি আমার সাদা চামড়ার কথা ভাবিনি, শুধু আমার পেছনের হলদেমুখো বার্মিজদের কথা ভাবছিলাম । আর এই মুহূর্তে জনতা আমাকে লক্ষ করছিল, স্বভাবতই আমি ভীতু নই, যখন আমি একা থাকি তখনো না। স্থানীয় লোকদের সামনে সাদা চামড়ার সাহেবরা কখনো ভীতির ভাব প্রদর্শন করতে পারে না, স্বাভাবিকভাবে আমিও তাই ভীত নই । আমি শুধু ভাবছিলাম যদি হাতিটা আমাকে আক্রমণ করে তার পায়ের নিচে পিষে ফেলে তাহলে উপস্থিত বার্মিজরা দুঃখ না করে মজা পেয়ে হাসতে থাকবে। পাহাড়ের উপরে দ্রাবিড় কুলিটার দাঁত বের হওয়া মৃতদেহটা ওদের কষ্ট দিলেও আমার ক্ষেত্রে কিন্তু তার ব্যতিক্রম হবে। এর বিকল্প কোনো কিছু ছিল না, আমি ম্যাগাজিনে গুলি ভরলাম এবং সঠিক লক্ষ্য স্থির করতে চেষ্টা করলাম। উৎফুল্ল জনতা শান্ত হয়ে এই নাটকের শুরুটা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে দীড়িয়ে রইল । অবশেষে একটি প্রাণী হত্যার ব্যাপারটি তারা স্বচক্ষে দেখতে যাচ্ছে। জার্মানিতে তৈরি সুন্দর রাইফেলটির দৃষ্টি ফেলার স্থানটি একটু বাকা । আমি তখনো বুঝতে পারিনি যে, একজন হাতি শিকার করতে গিয়ে তার কানের কাছে সর্বদা গুন গুন করা সমস্ত বাধাকে পরিহার করবে । আমি হাতিটার ঠিক কান বরাবর নিশানা করলাম । হাতির মাথাটাকে লক্ষ্য করে আমি তার কানের একটু উপরের দিকে রাইফেল তাক করলাম।

যখন আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম তখন কোনো বিকট আওয়াজ কিংবা লাথির শব্দ আমার কানে আসেনি কিন্তু উপস্থিত জনতার দানবিক উল্লাস শুনতে পেলাম । গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পশুটার মাঝে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করা গেল । প্রাণীটা একটুও নড়ল না, আবার বসেও পড়ল না । কিন্তু তার শরীরে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল । প্রাণীটিকে দেহকুঞ্চিত অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সী মনে হল । গুলির ভয়াবহতাই যেন প্রাণীটাকে অসার করে ফেলেছে । শেষে এই দীর্ঘসূত্রিতার সমাপ্তি ঘটল পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে । আমি অনুমানে বলছি, হাতিটা হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল, মুখ থেকে তার লালা গড়াচ্ছিল । একটা বিশাল অসারতা যেন তাকে ক্রমেই ঘিরে ফেলছিল, সে সময়ে হাতিটাকে হাজার বছর বয়সী মনে হওয়াটাও অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না । একই লক্ষণ আমি আমার গুলি ছুড়লাম। আমার দ্বিতীয় গুলিতে হাতিটা পড়ে না গিয়ে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে উঠে দাড়াল । তবে তার মাথাটা নিম্নমুখী হয়ে ছিল, পা গুলো কাপছিল । আমি তৃতীয়বারের মতো গুলি ছুড়লাম । একটি তীব্র বেদনা তার পুরো দেহটাকে কুকরে ফেলে দাড়াবার শেষ শক্তিটুকুও কেড়ে নিল কিন্তু শুয়ে পড়ার সময় মনে হল সে আরেকবার উঠার চেষ্টা করছিল, পা গুলো যখন তার ক্রমেই নিম্নগামী হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন একটা পাহাড় ধ্বসে পড়ছে আর শুড়টা পাহাড়ের মতো আকাশমুখী হয়ে বৃক্ষের মতো পড়ে গেল। প্রাণীটা শুধু একবারই হুংকার ছাড়ল, শেষ ডাক । এরপর পতন ঘটল পেটটা আমার দিকে তাক করে। পতনের সময় মাটি এমন ভাবে কাপল, আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সে জায়গাটা সহ কেঁপে উঠল । আমি উঠে দাড়ালাম । আমাকে পাশ কাটিয়ে বার্মিজরা কাদার উপর দিয়ে দৌড়ে নামতে লাগল । যদিও হাতিটা তখনো মারা যায়নি । তবে সবাই নিশ্চিত যে প্রাণীটা আর উঠে দাড়াতে পারবে না । হাতিটা ঘড় ঘড় করে ছন্দ তুলে শ্বাস নিল। মুখটা ছিল খোলা। হাতির গলার ভেতরে লালচে আভাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তার মৃত্যু নিশ্চিত হতে আমি আরো বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম । কিন্তু প্রাণীটার শ্বাসক্রিয়া তখনো জোরেসোরেই চলছিল । শেষে. আমি হাতিটার বুক তাক করে অবশিষ্ট গুলি দুটো ছুড়লাম । লাল ভেলভেটের মতো রক্ত হাতিটার বুক থেকে গড়াতে লাগল । এখনও জীবিত সে, কিন্তু গুলিতে তার দেহটা একটুও নড়লনা, বিরতিবিহীনভাবে যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসক্রিয়া তখনো চলছিল, প্রাণীটা আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। সেই জগতে সে পাড়ি দিচ্ছিল যেখানে কোনো বুলেটই ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি ভাবলাম এই তীক্ষ্ণ চিৎকার থামিয়ে দেয়া উচিত। একই সাথে প্রাণীটা যেন মরতেও পারছিল না বাচতেও পারছিল না; যার জন্য আমার ছোটো রাইফেলটা এনে হাতিটার বুক ও গলার ভেতরে পর পর গুলি টুড়তে লাগলাম। কিন্তু হাতিটা এর কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হল না । তখনো ঘড়ির টিক টিক শব্দের মতো তার শ্বাসক্রিয়া চলছিল । অবশেষে আমি

সেখানে বেশিক্ষণ দাড়াতে না পেরে চলে এলাম । পরে আমি শুনেছিলাম যে হাতিটা আরো আধঘন্টা পরে প্রাণ ত্যাগ করেছিল। আমি সে স্থান হতে সরার আগেই বার্মিজরা ঝুড়ি, দা নিয়ে এসে পৌছে গিয়েছিল। পরে শুনেহিলাম, হাতিটার হাড় বের না হওয়া পর্যন্ত তারা বিকেল পর্যন্ত সবকিছু সংগ্রহ করছিল । পরে অবশ্য হাতি মারা ব্যাপারটি নিয়ে বিরতিবিহীন আলোচনা শুরু হয়েছিল । হাতিটার মালিক খুবই রাগাদ্বিত হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র ভারতীয় হওয়ার জন্য সে কিছু করতে পারেনি। এ ছাড়া নীতিগতভাবে আমি বৈধ কাজটিই করেছি, কারণ ক্ষ্যাপা হাতিকে পাগলা কুকুরের মতো হত্যা করা হোক এটা সবাই চায়। বিশেষ করে এর মালিক যখন একে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয় তখন এ ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। ইউরোপীয়দের মধ্যে এ ব্যাপারে মতের ভিন্নতা দেখা গিয়েছিল। প্রবীণেরা বলছিল, আমি সঠিক কাজটি করেছি আর যুবকেরা বলছিল, একটি কুলিকে হত্যার কারণে এত বড়ো একটা পশুকে হত্যা করা অন্যায়। কারণ তাদের হিসেবে নিম্ন শ্রেণীর একটি কর্নাটি কুলির চাইতে একটি হাতি অনেক বেশি মূল্যবান। আমি খুশি যে, হাতিটা কুলিটিকে হত্যা করেছিল, কারণ ঐ ব্যাপারটিই আমাকে হাতিটাকে হত্যা করার বৈধতা প্রদান করেছে। আমি আজো ভাবি যে, আমি নিজেকে অন্যদের কাছে আহাম্মক প্রমাণিত হওয়ার বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই যে হাতিটাকে গুলি করেছিলাম তা আসলেই কেউ বুঝেছিল কি না।